ভেতরে

এই সংখ্যা ছয় পাতার

মোদীর 'সুশাসন' ২
কৃষক হত্যার বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে ... দেশ ... ৩
'আচ্ছে দিন'-এর কল্পসৌধ ও হিন্দুত্বের জাগরণ ... ৪
'শয়তানের উকিলে'র শয়তানি ... ৫

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২২ সংখ্যা ২ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৮ জানুয়ারী ২০১৫

ওবামার ভারত সফর

২৪ জানুয়ারী প্রতিবাদ দিবস পালন করুন

(গত ৩ জানুয়ারি ২০১৫, সি পি আই, সি পি আই (এম), সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি আই (সি) এবং আর এস পি—এই ছটি বাম দল নিম্নলিখিত যৌথ প্রেস বিবৃতিটি দেয়)

মোদী সরকার এবং বিজেপি হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোর কার্যকলাপকে অবাধ করে তুলেছে যারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এই সংকটকালে ভারত সরকার এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারির প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামাকে।

এই ঘটনা চূড়ান্ত পরিহাসময় রূপেই দেখা দিচ্ছে, কেননা যে দিনটি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেই দিনটিকে মহিমান্বিত করবেন এমন এক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যে দেশটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ হানতে ও তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টার কোন কসুর করেনি। লিবিয়ার উপর আগ্রাসন এবং ইরাকে আবার সেনা পাঠানো ও বোমাবর্ষণ শুরুর জন্য ওবামাই দায়ী। সিরিয়ার জাতীয় সত্তাকে ধ্বংসের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্যই বাম দলগুলো ওবামার সফরের বিরোধিতা করছে—

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ার মত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে তার নিশানা করছে এবং ঐ দেশগুলো ও সেগুলোর সরকারকে বিপন্ন করে তুলছে।

(২) ইজরায়েল দখল করে রেখেছে প্যালেস্তাইন ও আরব দেশগুলোর ভূখণ্ড এবং প্যালেস্তাইনের জনগণের উপর ঔপনিবেশিক নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক হয়ে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(৩) এশিয়ায় তার সক্রিয়তার ভিত্তিস্বরূপ সে তার নৌ ও সেনা বাহিনীর এক বড় অংশকে এশিয়ায় স্থানান্তরিত করেছে এবং এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে ও এই অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি করছে।

(৪) আফগানিস্তানে মার্কিন হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানে তার ভূমিকা মৌলবাদী শক্তিগুলোকে পুষ্ট করেছে যার বিপর্যয়কর পরিণাম ভারতের কাছে এক সতর্কবার্তা হয়েই দেখা দিচ্ছে।

(৫) যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র রক্ষার অছিলায় যুদ্ধ বাধায়, তার নিজের দেশে পুলিশ বাহিনী সংঘটিত বর্ণবাদী হত্যার জন্য সে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখোমুখি হচ্ছে। মার্কিন সরকারের মদতে সি আই এ-র চালানো অত্যাচার এবং নিরীহ জনগণকে ইসলাম সন্ত্রাসবাদী রূপে চিত্রিত করার ভয়াবহ নিদর্শন সম্প্রতি সামনে এসেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র লঙ্ঘনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেশগুলোর অন্যতম রূপে প্রতিপন্ন করেছে।

বিজেপি সরকার মার্কিনপন্থী বিদেশ নীতি অনুসরণ করছে যা স্বাধীন জোট-নিরপেক্ষ বিদেশ নীতির বিপরীত। ভারতীয় ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্যই তা করা হচ্ছে।

বাম দলগুলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ঃ

(১) ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা কাঠামো চুক্তিকে আরও দশবছরের জন্য নবীকরণ করা হয়েছে। এই চুক্তি ভারতকে এশিয়ায় মার্কিন সামরিক রণনীতির সঙ্গে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ করবে।

(২) মার্কিন স্বার্থের অনুকূল করে তোলার জন্য প্যালেস্তাইন, ইজরায়েল এবং ইরানের সাপেক্ষে নিজের বিদেশনীতির দিশাকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

(৩) মার্কিন পুঁজির কাছে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রকে খুলে দেওয়ার জন্য ওবামা প্রশাসন লাগাতার চাপ দিয়ে এসেছে যার কাছে নতিস্বীকার করে মোদী সরকার বীমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে ৪৯ শতাংশ করে তুলে এক অর্ডিন্যান্স জারি করেছে।

(৪) মার্কিন ওষুধ কোম্পানিগুলোর সুবিধার জন্য, ভারতে বেশি দামে তাদের ওষুধ বিক্রি করতে পারার জন্য ভারতের পেটেন্ট নীতিকে দুর্বল করে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে।

(৫) সরকারি সংগ্রহ এবং গণবণ্টন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলে খাদ্য সুরক্ষা নীতি পরিত্যাগের জন্যও আমেরিকা ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

(৬) মার্কিন কর্পোরেশনগুলোর সুবিধার লক্ষ্যে শ্রমিকদের অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষার আইনগুলোকে নখ-দন্তহীন করে তোলার জন্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে চাপ দিচ্ছে।

(৭) পারমাণবিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক মার্কিন কোম্পানিগুলোর সুবিধার জন্য অসামরিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইনকে লঘু করে তুলতে ওবামা-মোদী যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ওবামা সফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাম দলগুলো ২৪ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস রূপে পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।

মার্কিন আগ্রাসন বন্ধ কর

ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলানো চলবে না

ভারত-মার্কিন রণনৈতিক সহযোগিতা নিপাত যাক

স্বাক্ষর—

প্রকাশ কারাত, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই (এম)
সুধাকর রেড্ডি, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন
প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি)
দেবব্রত বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক
অবনি রায়, আর এস পি

---

২৪ জানুয়ারী—দুপুর ঃ ৩টা

বাম দলগুলোর ডাকে

কলকাতার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে জমায়েত

মার্কিন তথ্যকেন্দ্র অভিমুখে মিছিল

সম্পাদকীয়

বছরের শুরু থেকেই আন্দোলনে যাদবপুরের ছাত্ররা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমরণ অনশন আন্দোলন শুরু করেছেন। সর্বশেষ সাধারণ সভা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুসারেই আন্দোলনের এই নতুনতর পর্যায় শুরু। কয়েকটি দাবিতে এই আন্দোলন চলছে চারমাস যাবত। অবশ্যই নজরকাড়া দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, যা নানারূপে হয়ে চলেছে। প্রথম ও প্রধানতম দাবি, উপাচার্যের পদত্যাগ। এছাড়া আরও কয়েকটি দাবি রয়েছে, ২৮ আগস্টের ছাত্রী নিগ্রহের তদন্ত ও যৌন নিগ্রহকারীদের শাস্তি চাই, পরিচ্ছন্ন তদন্তের স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের একতরফা বানানো পুতুল কমিটি ভেঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে নতুন করে, ১৬ সেপ্টেম্বর অবরোধকারী ছাত্রদের উপর রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও গুণ্ডাদের নির্মম লাঠিচার্জ, ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, পাইকারি গ্রেপ্তারির বিচার চাই। এর সাথে দাবি যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে পুলিশী চেক পোস্ট বসানো ও পরিচয় তল্লাশীর পলিসি প্রত্যাহার করতে হবে। ছাত্রদের আমরণ অনশন শুরু হয়েছে ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে। তবু ক্ষমতার দম্ভে উপাচার্য পিছু হটার দাবি মানার কথা বিবেচনা না করে উল্টে আন্দোলনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-কুৎসা করার পন্থাই চালিয়ে যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে প্রশাসনিক ভবনের বাইরে বসে কাজ করে 'প্রতিবাদ' জানানোর নামে তথাকথিত 'ধর্ণা' নাটক পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছাত্ররা উপাচার্যকে বয়কট আন্দোলনে অবিচল এবং এই দাবি না মেটা পর্যন্ত বিকল্প কোন আলোচনা প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার থেকে শুরু করে রাজ্যপাল, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বা তৃণমূল, বিজেপি ইত্যাদি কারও চাপ, কারও টোপের সামনে ছাত্ররা দুর্বলতা দেখাননি। একসাথে আন্দোলনের পথে অনিবার্যভাবেই ঠিক-বেঠিকের চিন্তাগত মতাপার্থক্য আসে, এসেছে, এসে পড়ে, সেই সংঘাতের মধ্যে যেতেই হয়, আন্দোলনকে দুর্বল করে এমন ভাবনাগুলোকে অবশ্যই দূর করা দরকার হয়। এই প্রশ্নে যাদবপুরের আন্দোলন নিশ্চিত নজীর স্থাপন করেছে, দৃষ্টান্ত নির্মাণ করছে। তার ধারাবাহিকতা, অবিচলতা ও ঐক্যকে ধরে রাখার উপাদানগুলোকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবির গণরায় বার করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার জনমত যাচাইয়ের যতরকম গণতান্ত্রিক উপায় আছে প্রায় সবই করে দেখানো হয়েছে। শান্তিপূর্ণ নিরন্তর ধর্ণা অবস্থান, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, সাধারণ সভা, শ্রেণীকক্ষে থাকা কিন্তু প্রতিবাদে হাজিরা না লেখানো, গণভোট করা এবং সর্বোপরি ঐতিহাসিক ''হোক কলরব'' উত্তাল মিছিল। আন্দোলন তার মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে যাদবপুরের অধ্যাপকদের গরিষ্ঠাংশের সমর্থন, প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও বৃহত্তর জনকল্লোল থেকে। যে আন্দোলনকে আর এস এস বংশোদ্ভূত রাজ্যপাল হুকুম দিয়ে প্রত্যাহার করাতে ব্যর্থ হয়েছেন, বরং তিনি সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে নিজেকে নিচের স্তরে নামিয়েছেন, ছাত্রদের প্রত্যাখ্যানের পাত্র করে তুলেছেন। রাজ্যপালের সুরে হুমকি দিয়েছিল রাজ্য বিজেপিও, কিন্তু তাদের লম্ফঝম্ফ ছাত্ররা পাত্তাই দেয়নি। রাজ্যের তৃণমূল সরকারই যাদবপুরের উপাচার্যের খুঁটি। সেই খুঁটির জোরেই উপাচার্যের অস্থায়ী থেকে স্থায়ী পদ জুটেছে। বশংবদের পুরস্কার মিলেছে। তবে মমতা সরকার এই অবস্থান যত চালিয়ে যাবে তত আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করবে। এই আন্দোলনে টি এম সি পি-র দাপট ফলানোর কোনও জায়গাই নেই। টি এম সি-র যুবনেতা একবারই ঔদ্ধত্য দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন অশ্রাব্য কিছু কুৎসা করে। সেখানেই তাঁকে থেমে থাকতে হয়েছে। উপাচার্য অগত্যা আন্দোলন ভাঙ্গতে আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বৈঠককে টোপ হিসেবে রাখছেন। কিন্তু তার চালাকী বৈঠক বয়কটের মাশুল গুণেছে। আগে উপাচার্যের পদত্যাগ চাই, তারপরে ভোট। এটাই আমরণ অনশনরত ছাত্রদের সাফ বার্তা।

যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। নতুন বছরে নতুন করে আবার আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলন হয়ে উঠুক রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের মুখ।

আসামে সংঘটিত গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে সি পি আই (এম এল)

ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যাণ্ড (সংবিজিত) গোষ্ঠীর হাতে চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত আসামের প্রায় ৭০ জন আদিবাসী হত্যার পর থেকে সি পি আই (এম এল) ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সি পি আই (এম এল) দাবি জানিয়েছে—এই গণহত্যার দায় নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকেই আদিবাসীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, ঝুলে থাকা এলাকাগত বিভাজন এবং জনজাতি সংঘাত ও বিদ্রোহের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সি পি আই (এম এল) সমস্যাটিকে তুলে ধরে বলেছে, একের পর এক রাজ্য সরকার এবং মোদী সরকার সহ কেন্দ্রীয় সরকারগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাত ও অসন্তোষগুলোর সমাধানের পরিবর্তে একটি অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার নীতিই গ্রহণ করেছে। আসামে শাসক রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোকে দিয়ে বারবার হিংসা সংঘটিত করাতেও পিছপা হয়নি। সংবিজিত গোষ্ঠী লোকসভা নির্বাচনের সময় মুসলিমদের গণহত্যা সংঘটিত করেছিল। সেই সময় মুসলিমদের ঐ গণহত্যা থেকে বিজেপি নির্বাচনী ফায়দা তুলেছিল। গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে সি পি আই (এম এল) আসামে যেমন আন্দোলন চালিয়ে আসছে, তেমনি দিল্লীর যন্তর-মন্তরেও আয়সার নেতৃত্বে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ঐ গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে।

মোদীর 'সুশাসন'

স্বৈরাচারী কর্পোরেট-স্বার্থমুখী এবং সাম্প্রদায়িক আক্রমণ

কর্পোরেট স্বার্থমুখী নীতি এবং তাঁর 'হিন্দু রাষ্ট্র'র এজেণ্ডাকে যুগপৎভাবে সবলে চালিত করতে মোদী সরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সংস্থাগুলোকে চূড়ান্তরূপে অবজ্ঞা করে চলেছে এবং এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক লক্ষণ হয়েই দেখা দিচ্ছে।

একদিকে শাসক বিজেপির বিশিষ্ট সাংসদদের মদতে পুষ্ট হয়ে আর এস এস এবং তার সংগঠনগুলো 'ঘর ওয়াপসি' প্রচারকে সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত করে তুলছে। এরপর মানব সম্পদ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই বললেন যে, বড়দিন কোন ছুটির দিন হবে না এবং এইভাবে সুপরিকল্পিতভাবে বড়দিনের উৎসবেরই অবমাননা করলেন। আর বড়দিনকে কব্জা করে সরকারিভাবে পরিণত করা হলো বিজেপি নেতা বাজপেয়ী এবং হিন্দুত্ব তাত্ত্বিক মদন মোহন মালব্যর জন্মদিনের উৎসব দিবসে। গডসের মূর্তি ও মন্দির গড়ার চক্রান্ত চলছে, এরই সাথে বিজেপির এক সাংসদ গডসেকে দেশপ্রেমিক বলে ঘোষণা করার কথা বলেছেন। এক পূর্ণমন্ত্রী সহ বিজেপির নেতৃবৃন্দ এবং মোদীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুরু প্রচারক চলচ্চিত্র পিকের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি আর হুমকি জারি করেছেন এবং আর এস এস-এর সংগঠনগুলো সিনেমা হলগুলোতে ভাঙচুর চালিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর এস এস-এর প্রণালীবদ্ধ অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

'প্রান্তবর্তী গৈরিক' শক্তিগুলোর সাম্প্রদায়িক প্রচার থেকে মোদী নিজেকে 'দূরে রেখেছেন'—এ সম্পর্কে মোহ পোষণের কোন অবকাশ আর থাকতে পারে না। মোদী এখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকায় তথাকথিত এই 'প্রান্তিক শক্তি' এখন চালকের আসনে এবং তার তাদের 'হিন্দু রাষ্ট্র'র এজেণ্ডাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু এবং বিরোধী মত পোষণকারীদের সন্ত্রস্ত করে তোলাটা এখন মোদীর 'প্রশাসন' প্যাকেজের অবিচ্ছিন্ন অংশ।

ইতিমধ্যে মোদী সরকার সংসদকে এড়িয়ে কোন বিতর্ক-আলোচনা ছাড়াই 'অর্ডিন্যান্স'-এর মাধ্যমে সমস্ত ধরণের কর্পোরেট স্বার্থবাহী বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোকে বাস্তবায়িত করছে। বিরোধী পক্ষকে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দৌরাত্মের মোকাবিলায়, আর কয়লা অর্ডিন্যান্স, বীমা অর্ডিন্যান্স আর এবার জমি অধিগ্রহণ (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্সকে পাশ করানো হল বিন্দুমাত্র বিতর্ক না চালিয়ে।

কয়লা অর্ডিন্যান্স বেসরকারি উদ্যোগীদের বাণিজ্যিকভিত্তিতে লাগামহীনভাবে কয়লা খননের পথ প্রশস্ত করেছে, যারা এখন কয়লা খনন করে খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারবে। ইনসিওরেন্স অর্ডিন্যান্স মার্কিন বীমা কোম্পানিগুলোর কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে, যে কোম্পানিগুলোই ২০০৮-এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল এবং তারা এখন ভারতের বীমা বাজারে ঢুকে তাকে নিংড়ে নিয়ে ভারতের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

জমি গ্রাসের বিরুদ্ধে সারা দেশে কৃষকদের প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই ইউ পি এ সরকার জমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৩ পাশ করিয়েছিল। কৃষকদের সুরক্ষা তুলে দেওয়া এবং কর্পোরেটদের দ্বারা জমি গ্রাসকে সহজসাধ্য করে তোলার লক্ষ্যে মোদী সরকারের অর্ডিন্যান্স ঐ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোকে শিথিল করে তুলছে। কোন সরকার সংসদে পাশ হওয়া কোন আইনকে যদি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বানচাল করে দেয় ও তাকে নখদন্তহীন করে তোলে তবে তা নির্লজ্জ স্বৈরাচারী পদক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতিতে একেবার সীমিত মাত্রায় ব্যবহারের জন্যই অর্ডিন্যান্স ব্যবস্থা। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে এখনই অর্ডিন্যান্স পাশ করানোর প্রয়োজনটা কোথায় ছিল? স্পষ্টতই, এক অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছে যেখানে কর্পোরেটদের লাগামহীন লুণ্ঠনের আশু দাবিকে তুষ্ট করতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোতে অন্তর্ঘাত করা হচ্ছে।

যে সরকার কৃষকদের জমি গ্রাসে কর্পোরেটদের মদত যোগাচ্ছে, সারা দেশে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যাকে ঠেকাতে তার কোন আগ্রহই দেখা যাচ্ছে না। এর বিপরীতে মহারাষ্ট্রের এক বিজেপি সাংসদ ঘোষণা করেছেন, ''কৃষকদের যদি চাষ করার সংগতি না থাকে তবে ওরা মরুক।''

এছাড়াও মোদী সরকার ২০১৪-১৫-র স্বাস্থ্য পরিষেবা বাজেটের ২০ শতাংশ ছেঁটে ফেলেছেন। বিশ্বের যে দেশগুলোতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় সবচেয়ে কম ভারত তার অন্যতম, আর মোদী তাকে আরও ছেঁটে দিয়েছেন। এর অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাধিগুলোর নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগে তহবিল শুকিয়ে যাবে—যা ঘাতক ব্যাধিগুলোর কাছে ভারতের দরিদ্রদের আরও অসহায় করে তুলবে।

বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে বাঁচানোর লক্ষ্যে কলকাঠি নেড়ে সি বি আই-কে নির্লজ্জভাবে কাজে লাগানোর মধ্যেও মোদীর মার্কামারা প্রশাসনিক মডেলের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে—যে অমিত শাহ সোহরাবুদ্দিন শেখ, কৌসর বি এবং তুলসিরাম প্রজাপতি এই তিনজনের হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অভূতপূর্ব এক পদক্ষেপ নিয়ে সি বি আই-এর এক আদালত তাদের রায়ে ঘোষণা করেছে যে, অমিত শাহকে এই তিনটি হত্যায় বিচারের মুখোমুখি হওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যগুলোকে ভালোভাবে পরীক্ষা করার আগেই কোন নিম্ন আদালতের পক্ষে কোন অভিযুক্তকে সরাসরি নিরপরাধ বলে রায় দেওয়াটা বিচার ব্যবস্থার নির্ভেজাল প্রহসন। আর সি বি আই এমনিতেই মামলাটিকে দুর্বলভাবে সাজিয়েছে এবং তারা ঐ রায়কে এখনও চ্যালেঞ্জ জানায়নি—এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে অমিত শাহকে রক্ষার খেলায় তারা মেতেছে।

নতুন বছর সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তি এবং জনগণের আন্দোলনগুলোর কাছে এক চ্যালেঞ্জ ভরা বছর হতে চলেছে। ভারতের গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে তুলতে উদ্যত সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেট আক্রমণের বিরুদ্ধে নতুন বছরকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বছর করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলুন।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪)

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

''আজকের দেশব্রতী''
বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে অনিবার্য কারণবশতঃ
কলকাতা বইমেলার পরে
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

কৃষক হত্যার বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে আমাদের দেশ

‘উন্নয়নের’ প্রবল ঢক্কানিনাদের আড়ালে মোদী সরকারের প্রধানমন্ত্রীত্বে কৃষক আত্মহত্যার খবর আবার আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। ২৫ নভেম্বর ২০১৪ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, ২০১৪-এর প্রথম চারমাসে মহারাষ্ট্রে ২০৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন—২০১৩ সালের গোটা বছরে যতজন আত্মহত্যা করেছিল (৪০৭ জন) তার প্রায় অর্ধেক! বলাই বাহুল্য, ২০১৪ এপ্রিল পর্যন্ত হাতে আসা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে অন্য ৫টি ‘বৃহৎ রাজ্যের’ তুলনায় মহারাষ্ট্র কৃষক আত্মহত্যার প্রশ্নে আজও রয়েছে এক নম্বরে।

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে হাড়-হিম করা তথ্যের দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক ঃ

- **১৯৯৫ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৩৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।**
- **ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী রাজ্য মহারাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ১০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন বিগত দশ বছরে।**
- **২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বছরে মহারাষ্ট্রে গড়ে ৩,৬৮৫ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।**
- **২০১১ পর্যন্ত জনসংখ্যার অন্য অংশের তুলনায় ভারতীয় কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা ৪৭ শতাংশ বেশি!**
- **শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যার হার ১৬২ শতাংশ!**

(তথ্যসূত্র ঃ এন সি আর বি)

গভীরভাবে সংকটের আবর্তে ভারতীয় কৃষি। প্রায় দু’দশক ধরে ভারতের কৃষিতে চূড়ান্ত সংকটের দগদগে ক্ষত কৃষি অর্থনীতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১২-১৩ সালে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এন এস এস ও)-র তরফ থেকে তৈরি করা রিপোর্ট ‘‘কৃষিজীবী পরিবারগুলোর অবস্থা সংক্রান্ত মূল্যায়নের সার্ভে’’ (‘‘সিচ্যুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে অফ এগ্রিকালচারাল হাউসহোল্ডস’’)-তে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, ‘কৃষি যে শুধুমাত্র মারাত্মক এক সংকটেই পড়েছে তা নয়, **কৃষি ব্যবস্থাই দ্রুতগতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে**।’

এদিকে, কৃষি থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন উৎখাত হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়েছিল যে পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে, ২০১৫ সালের ভেতরে ভারতবর্ষের শহরগুলোতে গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের সংখ্যা হবে সমগ্র ব্রিটেন-ফ্রান্স এবং জার্মানির সম্মিলিত জনসংখ্যার সমান! **বিশ্ব ব্যাঙ্কের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫-এর মধ্যে ৪০ কোটি মানুষ গ্রামীণ ভারত থেকে উৎখাত হয়ে শহর-শহরতলিতে চলে আসতে বাধ্য হবেন।** ২০১১-র জনগণনা জানাচ্ছে যে, প্রতিদিন ২,৪০০ কৃষক কৃষিকাজ থেকে সরে শহরমুখো হচ্ছেন। আর, বেশ কিছু অ-সরকারি স্বাধীন সংস্থা জানাচ্ছে যে এই সংখ্যাটি আরও বেশি। ফি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষক কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে শহরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। ঋণের ফাঁদে ক্রমাগত জর্জরিত হয়ে পড়া কৃষকদের সামান্যতম উন্নতি না হওয়ায় প্রায় ৫৮ শতাংশ কৃষক খালি পেটে রাতে ঘুমোতে যান। **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ক্রমাগত সংকুচিত হওয়া কৃষক-ভিত্তির উপরই কিন্তু লাগাতার আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।**

গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া কৃষকরা কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছেন না। অর্থাৎ চীন যেভাবে উদ্বৃত্ত গ্রামীণ জনসংখ্যাকে শিল্পে অন্তর্ভুক্ত বা যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, ভারত তা আদপেই পারেনি। কর্মহীন বৃদ্ধির অর্থনৈতিক বিকাশে গ্রামীণ ‘উদ্বৃত্ত’ অসংগঠিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই যুক্ত হচ্ছে—শ্রমের ক্রমবর্ধমান অস্থায়ীকরণ বা ইনফর্মালাইজেশনের মাধ্যমে। যোজনা পর্ষদ এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে যে, ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ কৃষি কাজ থেকে উৎখাত হওয়ার পর ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মত উন্নত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত না হয়ে নির্মাণ শিল্পের মত অদক্ষ শ্রমেই স্থানান্তরিত হচ্ছেন।

কৃষক আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা যে পাঁচটি রাজ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেগুলো হল—মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। ১৯৯৫ সাল থেকে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এন সি আর বি (এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এক সংস্থা) আত্মহত্যার লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা রেকর্ডগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষে কৃষক আত্মহত্যার নজীর আর কোথাও কখনও দেখা যায়নি। যতদিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে আত্মহত্যার সংখ্যা। এন সি আর বি-র তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর আত্মহত্যার সংখ্যা পূর্বেকার ৮ বছরের তুলনায় ১,৮২৫ বেশী। ফি বছর কৃষিকাজ থেকে উৎখাত হওয়া কৃষকদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, আত্মহত্যার সংখ্যাও যেন বাড়ছে সমান তালে!

২০০৮ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট তৈরি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়। ঐ রিপোর্ট বলেছিল, ২০১৫ সালের মধ্যে চূড়ান্ত দারিদ্র ও ক্ষুধাকে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে কৃষিক্ষেত্রকে বিকাশের এজেণ্ডার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। ঐ রিপোর্ট আরও বলেছিল, গত দুই দশক ধরে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলো চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। যৎসামান্য সরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে। তাদের হিসাবে, ভারতের মত দেশগুলো কৃষিক্ষেত্রে মাত্র চার শতাংশ বিনিয়োগ করে। আলোচ্য রিপোর্ট আরও জানায় যে, দারিদ্র কমাতে কৃষিক্ষেত্রে জিডিপি-র বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রের বাইরে জিডিপি বৃদ্ধি থেকে অনেক বেশি কার্যকরী। ভারতবর্ষে কৃষিক্ষেত্রটি চূড়ান্তভাবে অবহেলিত। বাজেট বরাদ্দ দিনের পর দিন কমে আসছে। **একাদশ যোজনায় কৃষির জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ কোটি টাকা। তার পরের পাঁচ বছর, অর্থাৎ দ্বাদশ যোজনায় বাজেট বরাদ্দ হল ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা। আর ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের জন্য দেওয়া হল মাত্র ২৪ হাজার কোটি টাকা। বিপরীতে, ঐ একই বছরে শিল্পক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়া হল ৫.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা।**

সরকারি বরাদ্দ, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য থেকে হাত ক্রমে গুটিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের উপর নামানো হয়েছে আরও বহুমুখী হামলা। গোটা দেশজুড়ে মাত্র ৮ শতাংশ কৃষক প্রতি বছর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু গত তিন বছর যাবত, ধান ও গমের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল ফি বছরে বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি রাজ্যগুলোকে জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উপর রাজ্যগুলো যেন বোনাস ঘোষণা না করে। পাশাপাশি এই পুরো ব্যবস্থাটাকেই ভেঙ্গে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দ্য কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্ট অ্যাণ্ড প্রাইসেস (সি এ সি পি) বেশ কিছুদিন ধরে দাবি জানাচ্ছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থাপনাকে পুরোপুরি গুটিয়ে এনে বাজারের হাতে গোটা প্রক্রিয়াকে ছেড়ে দেওয়া হোক—যাতে বাজারের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ফসলের দাম।

দিন কয়েক আগে, চরম কৃষক বিরোধী শর্তসমূহকে যুক্ত করে জমি অধিগ্রহণ আইনের উপর মোদী সরকার অধ্যাদেশ জারি করেছে। পি পি পি প্রোজেক্ট সহ যে কোন পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রের এক আজগুবি সংজ্ঞাকে যুক্ত করে বহুফসলি থেকে শুরু করে যে কোন চরিত্রের জমি কৃষকের সম্মতি ছাড়াই ঢালাও অধিগ্রহণ করার বলপূর্বক অধিকার রাষ্ট্র তার হাতে নিয়ে নিল। অধিগৃহীত জমি থেকে উৎখাত হওয়া কৃষিজীবীদের পুনর্বাসন ও পুনর্স্থাপনের কোন দায় সরকারের থাকল না। আর এভাবেই খিড়কি দরজা দিয়ে ভিন্ন মোড়কে আবার ফিরিয়ে আনা হল ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন, যার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কৃষকরা বহু সংগ্রাম করেছিলেন। চরম সংকটে জর্জরিত কৃষিক্ষেত্রকে চূড়ান্ত ধ্বংসের লক্ষ্যেই মোদী সরকারের এই অধ্যাদেশ। মোদীর রঙ্গমঞ্চে কদর্য, কুৎসিত কুনাট্যের যে প্রদর্শনী এখন মঞ্চস্থ হচ্ছে তার পর্দা ক্রমেই উন্মোচিত। - **অতনু চক্রবর্তী**

জমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৩ সংশোধনের জন্য মোদী সরকারের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সারা ভারত কিষাণ মহাসভার বিবৃতি

জমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৩ সংশোধনের জন্য মোদী সরকারের মন্ত্রীসভা অর্ডিন্যান্স জারির প্রতি যে অনুমোদন দিয়েছে সারা ভারত কিষাণ মহাসভা তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, ২০১৩-র যে আইনকে বর্তমান অর্ডিন্যান্স সংশোধন করতে চায়, সেই আইন কৃষকদের ব্যাপক প্রতিবাদের পরিণতিতেই রচিত হয়েছিল। ঐ আইন তৈরির পিছনে এই স্বীকৃতিও কাজ করেছিল যে, জোরজবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ, কর্পোরেটের জমি গ্রাস, উচ্ছেদ ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মূল ধাক্কাটা সারা দেশের কৃষকদের উপরেই এসে পড়ছে। ২০১৩-র ঐ আইন জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণকে তার আওতায় আনা এবং জমি অধিগ্রহণের আগে জনগণ এবং জমির মালিকদের সম্মতি গ্রহণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে জমি মালিকদের কিছুটা অধিকার দিয়েছিল। মোদী সরকারের অর্ডিন্যান্স এই আইনের যে সমস্ত সংশোধনী নিয়ে এসেছে তা ২০১৩-র আইনে যেটুকু গণতান্ত্রিক অন্তর্বস্তু ছিল তার ওপর এক আক্রমণ।

মোদী সরকারের অর্ডিন্যান্স ২০১৩-র আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিলোপ করতে চাইছে—একটি হল কিছু ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের আগে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বাধ্যতামূলক মূল্যায়ন আর অন্যটি হল প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফলে যে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের নির্দিষ্ট এক অংশের সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা। এই ধারা দুটিকে বিলুপ্ত বা সেগুলোকে লঘু করে তুলে এই অর্ডিন্যান্স কৃষকদের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে তুলতে চাইছে। মোদী সরকার ঐ অর্ডিন্যান্সের ন্যায্যতার পক্ষে এই যুক্তি দিচ্ছে যে, অর্ডিন্যান্স জমির মালিকদের প্রাপ্য ‘ক্ষতিপূরণ’ প্যাকেজকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। কিন্তু ঘটনা হল, শুধু ‘বৈধ’ জমির মালিকরাই নয়, আরও কিছু মানুষের জীবিকাও ঐ জমির উপর নির্ভরশীল। কিছু ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের এবং বেসরকারি প্রকল্পগুলোর জন্য সম্মতির ধারাটিকে যখন বিলুপ্ত বা লঘু করে তোলা হবে তখন চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পথে জমি অধিগ্রহণ শুধু অনিবার্য ব্যাপারই হবে না। স্থানীয় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল বেশ কিছু মানুষও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, কেননা অধিগৃহীত জমির মালিক না হওয়ায় তাঁরা ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্য হবেন না।

জানা যাচ্ছে যে, ২০১৩-র জমি অধিগ্রহণ আইনে আগের সময়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার যে ধারা ছিল সেটিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত কৃষক যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ পাননি বা জমি অধিগ্রহণের পর যাঁদের জমি কাজে লাগানো হয়নি ঐ ধারার বলে কৃষকদের কিছু সুরাহার ব্যবস্থা ছিল। ঐ ধারা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে নানা প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদ হওয়া কয়েক কোটি মানুষের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়ার আর কোন রাস্তা থাকবে না।

এছাড়াও, সংসদকে এড়িয়ে কোনরকম আলোচনা ও বিতর্ক ছাড়াই অগণতান্ত্রিকভাবে অর্ডিন্যান্স জারির পথ গ্রহণ করাটাও চূড়ান্ত ধিক্কারযোগ্য। গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোগুলোকে এড়িয়ে এই ধরণের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ—যা স্পষ্টতই কর্পোরেট ক্ষেত্রের প্রয়োজন ও লালসার দ্বারা চালিত হচ্ছে—অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক বিপদ সংকেত। এই অর্ডিন্যান্সের মধ্যে দিয়ে মোদী সরকার ছলে-বলে-কৌশলে কর্পোরেটদের দ্বারা কৃষকদের জমি গ্রাসকে সহজবোধ্য করে তুলছে। সরকারের অর্থনৈতিক নীতির কারণে দেশের প্রতিটি প্রান্তেই কৃষকরা যখন আত্মহত্যা করছেন, তখন কৃষকদের দূরবস্থা দূর করার কোন আগ্রহই সরকারের দেখা যাচ্ছে না। জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং ব্যাপকহারে জোরজবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ এবং উচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের অধিকারের দাবিকে তুলে ধরতে সারা ভারত কিষাণ মহাসভা ২০১৫-র ২ জানুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে।

‘‘আজকের দেশব্রতী’’ দপ্তরে সমস্ত জেলা থেকে নিয়মিত সংবাদ ও প্রতিবেদন পাঠানোর উদ্যোগ বজায় রাখুন। প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে ই-মেইল করে পাঠাতে হবে। —সম্পাদকমণ্ডলী

e-mail : deshabrati@gmail.com//cpimlwb@yahoo.com

‘আচ্ছে দিন’-এর কল্পসৌধ ও হিন্দুত্বের জাগরণ

১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ভাঙার আগের দিন শিবসেনা-র মুখপত্র ‘সামনা’-য় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে আমরা বুঝি সেইসব মুসলিম বিশ্বাসঘাতকদের যারা আমাদের দেশভাগ করেছে এবং যারা আমাদের এক মুহূর্ত স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে দেয় না। এর তিনদিন পরে, অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ভাঙার আটচল্লিশ ঘন্টা অতিক্রান্তির পর ৮ ডিসেম্বর এই ‘সামনা’-র সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে আবার লেখা হল—এই মসজিদ ভাঙার দৃষ্টান্ত থেকে মুসলিমরা যেন যথাযথ শিক্ষা নেয়, নতুবা তাদের কপালে অনুরূপ দুঃখ আছে। পরের দিন ৯ তারিখের সংখ্যায় আবার লেখা হল—সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের এদেশে আসার দরকার নেই, এদেশের পঁচিশ কোটি মুসলমান সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। আর এর ঠিক একমাস পর ৯ জানুয়ারি লেখা হয়েছিল—ভেণ্ডিবাজার, নালাবাজার, ডংরি এবং পীধনই এলাকার অর্থাৎ এই মিনি পাকিস্তানের সমস্ত মুসলিমদের এই এলাকাতেই গুলি করে মারা উচিত! —এই কথামৃত প্রকাশ করার বাইশ-তেইশ বছর পর দিল্লীর মসনদে বিজেপির ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্পষ্টতই হিন্দুত্ববাদীরা এখন অনেক বেশি উজ্জীবিত এবং এদেশকে হিন্দুর দেশ বানাতে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তারা এদেশের মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করে এদেশকে কেবলমাত্র হিন্দুদের দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে জাহির করতে সমস্ত পরিকল্পনাকে একমুখী করেছে। হিন্দুত্বের কলরবে এখন ‘গীতা’ জাতীয় গ্রন্থ হবে, অহিন্দুরা হিন্দু হবে, উর্দুর বিপরীতে হিন্দির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে, হারামজাদাদের অপসৃয়মানতায় রামজাদাদের অস্তিত্ব প্রকট হবে, জার্মান ভাষার স্থলে সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য পাবে, গান্ধীজীর পাশাপাশি নাথুরাম গডসেও সমতুলনীয় দেশপ্রেমিকের সম্মানে ভূষিত হবেন, গান্ধীজীর শহীদত্বের দিন নাথুরামকে সম্মান জানাতে শৌর্যদিবস হিসেবে পালিত হবে এবং রীতিমতো ঘটা করে গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। অর্থাৎ আগ্রাসী হিন্দুত্বের সর্বগ্রাসী রূপকে তাঁরা মূর্ত করে তুলতে চাইছেন।

।। ২।।

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের এখনও বিদেশি বলতে পছন্দ করেন। পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত মুসলিমরা এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছেন বা হচ্ছেন—হয় তারা দেশে ফিরে যাক, নতুবা হিন্দু হয়ে, হিন্দুত্বের সংস্কৃতির ধারক হয়ে, তারা এদেশের নাগরিক হয়ে উঠুক—এটাই হল হিন্দুত্ববাদীদের বক্তব্য। এর মধ্যবর্তী কোনও অবস্থান নেওয়া চলবে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক শাখার কার্যকরী সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া কোনরকম রাখঢাক না করেই বলেছেন, যে সমস্ত মুসলিমরা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন, তারা অনুপ্রবেশকারী; আর যেসব হিন্দুরা এসেছেন তারা হলেন শরণার্থী। অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠাতে হবে, আর শরণার্থীদের এদেশের নাগরিকত্ব দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, দিল্লী এবং মুম্বাইয়ে এরকম তিন কোটি অনুপ্রবেশকারী বাস করছেন। আর এরকম শরণার্থীদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। তোগাড়িয়ার দাবি এই অর্ধ লক্ষ হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল হিন্দু ‘শরণার্থী’ মাত্রেই কি হিন্দুত্ববাদী? দিল্লীর জনৈক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, হিন্দুত্ববাদীরা প্রথমত এইসব ‘শরণার্থী’ হিন্দুদের মন জয় করার লক্ষ্যে তাদের ক্যাম্প খুলে থাকার ব্যবস্থা করে, বিভিন্নরকম সুযোগ-সুবিধা জুগিয়ে তাদের আত্মজন হওয়ার চেষ্টা করে এবং একই সঙ্গে তাদের হিন্দুত্ব ঘরাণায় নিয়ে আসতে প্রলুব্ধ করে। এ ব্যাপারে সহজে কাজ না হলে, তারা রীতিমতো ভয় দেখাতে শুরু করে। গত নভেম্বরের শেষের দিকে নতুন দিল্লীর একটি বস্তির ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। নতুন দিল্লীর রংপুরি এলাকায় কোনোরকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বনদপ্তরের তরফে একটি ইজরাইল ক্যাম্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পরে জানানো হয় যে মাফিয়ারা ওই জায়গাটার দখল নেওয়ার চেষ্টা করছিল বলেই ক্যাম্পটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আসলে মাস ছয়েক আগে স্থানীয় আর এস এস নেতা নগেন্দ্র উপাধ্যায় এবং এলাকার বিজেপি নেতা সত্যপ্রকাশ রানাই এই ‘দখল’-এর গল্প তৈরি করেছিলেন। তাঁরা লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, এলাকার মুসলিম এবং অনুপ্রবেশকারীরা এই বস্তি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন; অনতিবিলম্বে যদি এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে বাংলাদেশীরা এখানে বসতি স্থাপন করবে; যেহেতু বিমানবন্দর অনতিদূরে অবস্থিত, কোনরকম সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে এই ক্যাম্পের অধিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই ছিলেন মুসলিম। এটাই হচ্ছে মূল কথা। আর এস এস একটা হনুমান মন্দিরকে তাদের শাখা সংগঠনের অফিস বানিয়েছিল এবং একটি কালীমন্দির দখলের ফন্দিও আঁটছিল। ইজরাইল ক্যাম্পের বাসিন্দাদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে হনুমান মন্দির দখল করে সেখানে অসামাজিক কাজকর্ম করা হচ্ছিল আর যেহেতু তাঁরা গত নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেননি, তাই তাদের বস্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লীর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই হিন্দুত্ববাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েকমাসে জায়গা তৈরি করা হয়েছে। দিল্লীর মেট্রোপলিটন কর্পোরেশন স্কুল থেকে গান্ধী এবং নেহেরুর ছবি সরিয়ে হিন্দুত্বের প্রচারক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ছবি টাঙানো হয়েছে। দাঙ্গার পরবর্তীতে পরীক্ষার ঠিক আগেই কয়েকজন মুসলিম ছাত্রকে ঐ স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ব্যাঙ্গালোরেও বর্ণবিদ্বেষের ঘটনা আকছার ঘটছে। প্রচারমাধ্যমের নজরে এসব ঘটনা এলেও তা গুরুত্ব পায় না। বর্ণবিদ্বেষজনিত কারণে মারধোর, ধর্ষণের মতো ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। কাজ সেরে রাত্রে বাসায় ফেরার সময় অনেকেই বর্ণবিদ্বেষজনিত কারণেই আক্রান্ত হচ্ছেন। বর্ণবিদ্বেষের শিকার এইসব নারী-পুরুষদের চিংকি, চিংচং, চাওমিন কিম্বা মেরি কম বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের একটা বিকৃত উচ্চারণে মেরি কম বলা হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লীর মসনদে আসীন হওয়ায় সংঘ পরিবার হিন্দুত্ববাদী চিন্তা, ধ্যান-ধারণার প্রচার ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর ফলে হিন্দুত্ববাদীদের জাতি বিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ যেভাবে সীমানা লঙ্ঘন করে চলেছে, যেভাবে অহিন্দুদের প্রতি আক্রমণের ভাষিক ও শারীরিক প্রকাশ বিসদৃশ বিস্তার লাভ করছে, তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে সারা দেশে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাকে অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। হিন্দুত্ববাদীদের আচার, আচরণ, উগ্রতা এবং সর্বোপরি আক্রমণমুখীনতার নগ্ন প্রকাশ জার্মানিতে হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের স্মৃতিবহ হয়ে উঠছে।

।। ৩।।

সংঘ পারিবারিক কাপালিকদের আগ্রাসী ভূমিকায় এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেকার একটা অংশ যে ভীত, সন্ত্রস্ত তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে উল্লেখযোগ্য হারে বিজেপিতে যোগদানেই তার প্রমাণ। ঘর ওয়াপসি-র মতো তথাকথিত ‘ধর্মযজ্ঞে’ মুসলিম ও খ্রিষ্টান আদিবাসীদের একটা অংশের সামিল হওয়াও এর প্রমাণ। একথা সত্য যে এইসব দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন প্রকার প্রলোভনে বশীভূত করেই হিন্দুত্ববাদীরা তাদের ধর্মান্তরিত করছে, তবু একথা অস্বীকার বোধহয় অযথার্থ যে একটা ভয়ের শীতল শাসন এঁদের আত্মসমর্পণে সামিল করেছে। সংবাদপত্র পরিবেশিত সংবাদে এমন সংবাদও জানা গিয়েছে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশ তাদের স্থানীয় সংগঠন মারফত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানিয়েছেন যে যদি ভাঙা বাবরির জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ করলে দেশে শান্তি স্থাপন হয়, তাহলে রামমন্দির গড়া হোক। এই আর্জির নিহিতার্থে ভয়ের শীতল সঞ্চরণ অননুভূত থাকে না।

এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সংঘ পরিবারের তরফে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থবর্গের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির উপকরণ সন্ধান ও প্রচারের বিষয়াবলীও লক্ষণীয়। কয়েক বছর আগে আর এস এস প্রধান রাজ্জু ভাইয়া বলেছিলেন যে ভারত-ই প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল! স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী মুম্বাইতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন! তিনি জানিয়েছেন যে হাতির মাথা গণেশের শরীরে প্রতিস্থাপন প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির প্রায়োগিক তথ্যের উদাহরণ! বিজেপির সংসদ সদস্য রমেশ পখরিয়ালও মোদীর এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে প্রাচীন ভারতের সাধুরা পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছিলেন! আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত জানিয়েছেন যে দীর্ঘ বারোশ বছর ধরে মুসলমান এবং ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের চিন্তাশক্তি দূষিত হয়ে গিয়েছিল, সেইসব বিদেশিদের চিন্তাভাবনা এবং মূল্যবোধ আমাদের শাসন করেছিল; এখন আমরা সেইসব দূষিত চিন্তার মূলোচ্ছেদ করতে চাই, আমাদের মনোভূমিকে নিরুপনিবেশিক করতে চাই। আর এই নিরুপনিবেশিকীকরণের অর্থ প্রাচীন ‘হিন্দু’ ভারতের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত সহ ধর্মগ্রন্থসমূহের ধূসর অক্ষরমালার মধ্যে নির্বিচার বিচরণ করা! গুজরাটে সরকারি বিদ্যালয়ে ‘তেজোময় ভারত’ শীর্ষক এক পাঠ্যগ্রন্থে লেখা হয়েছে যে ঋষি দ্বৈপায়ন ব্যাস গান্ধারীর শরীরের সেই কতিত অংশটুকু একশ টুকরো হয়ে একশ স্বতন্ত্র জলাশয়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এর দু’বছর পর গান্ধারীর শতপুত্রের জন্ম হয়! এই পাঠ্যপুস্তকে আরও লেখা হয়েছে যে ভারতবর্ষেই প্রথম দূরদর্শন আবিষ্কৃত হয়, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে যে কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এটাই তার প্রমাণ! —এইভাবে সংঘ পরিবার তাদের গৈরিক শিক্ষাদর্শ প্রবর্তনের মাধ্যমে একদিকে যেমন তথাকথিত বেদ-পুরাণের মধ্যে সব পেয়েছির আসরের সন্ধানে ব্রতী হয়েছে, তেমনই একইসঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের পৌরাণিক যুগের অবদান ও উৎকর্ষের অযৌক্তিক জয়গাথা প্রচার করে দয়ানন্দের ‘বেদের যুগে ফিরে যাও’-এর আহ্বানকেই নতুন করে অনুমোদন দিচ্ছে। এর ফলে জন্ম নিচ্ছে এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ যা অযৌক্তিকতার নির্বিচার আত্তীকরণে ফ্যাসিবাদের উত্থানকেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে।

।। ৪।।

হিন্দুত্বের জাগরণের নামে সংঘ পরিবার তার সমস্ত শাখা সংগঠনের মাধ্যমে যে বক্তব্য হাজির করতে চাইছে কোনও যুক্তি দিয়েই তাকে নিরীহ ও নিছক ধর্মীয় ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যায় না। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর রামমন্দির নির্মাণ যে শুধু তাদের একমাত্র কর্মসূচী নয়, তা তাদের পরবর্তী কর্মতৎপরতায় স্পষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের যেখানে যত পুরানো মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন আছে, তা প্রায় সবই হিন্দু মন্দির ভেঙে নির্মিত এরকম প্রচার প্রচারণাকে সামনে এনে তারা সেইসব পুরানো স্থাপত্য ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দু ভারত গঠনের তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসছে। মথুরা, বারাণসী সহ দেশের সহস্রাধিক স্থানে মসজিদ ভেঙে মন্দির উদ্ধারের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের স্বপ্নদর্শী হয়েছে। তাদের একাজে তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন পি এন ওক। তিনি তো তাজমহলকেও হিন্দু মন্দির ভেঙে নির্মিত বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে ওক তো সুপ্রীম কোর্টে পিটিশন করে জানিয়েছিলেন যে হিন্দু মন্দির ভেঙে তাজমহল নির্মিত হয়েছিল, অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। ওক তো আধুনিক উদারপন্থী ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে ভারতের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করার অভিযোগও করেছিলেন। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ওক প্রয়াত হলেও সংঘ পরিবার তাঁর দেখানো পথেই চলছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ব ব্রিগেড ওকের প্রদর্শিত পথেই হিন্দু ইতিহাস নির্মাণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, কেননা মধ্যযুগের প্রতিটি স্থাপত্য শিল্পকেই হিন্দুদের নির্মিত বলে ওক যে ঘোষণা করেছিলেন তা এদেশে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির প্রচার প্রচারণায় যথেষ্ট কার্যকরী বলে সংঘ পরিবার মনে করে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর সরকার কাকতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াই সুদর্শন রাও-কে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টরিক্যাল রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করেছেন। হিন্দুত্ববাদীদের আদর্শের অংশীদার হওয়ায় অধ্যাপক রাও সহজেই এই সম্মানজনক পদ পেয়েছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তো অধ্যাপক রাও-এর যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। আর একজন ঐতিহাসিক ডি এন ঝা বলেছেন যে অধ্যাপক রাও মহাভারতের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাস করেন। আর সম্ভবত এই কারণেই অধ্যাপক রাও-কে মোদী হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর শরিক হিসেবেই এই সম্মানজনক পদে অভিষিক্ত করেছেন। ঐতিহাসিক ঝা বলেছেন যে ঐতিহাসিকদের কাছে বিশ্বাস নয়, যুক্তিধর্মিতাই বিবেচ্য বিষয়। অথচ ফ্যাসিস্তরা যুক্তির বশ্যতা মানে না, তাদের কাছে অযুক্তিই বড়ো, বিশ্বাসই বড়ো আর নরেন্দ্র মোদীর কাছে যুক্তির প্রত্যাশা করা অর্থহীন। নিজেদের হিন্দুত্ববাদী কর্মকাণ্ডের সহায়ক হবে না এই বিবেচনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেইনিং-এর পরিচালক অধ্যাপক প্রবীণ সিনক্লেয়ার-কে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, অথচ অধ্যাপক সিনক্লেয়ার এই পদে গত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যোগ দিয়েছিলেন। এভাবে সংঘ পরিবার তাদের শিক্ষাদর্শের ফলিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদেরই বেছে নিচ্ছেন যাঁরা তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবেন। শিক্ষাকে গৈরিকীকরণের লক্ষ্যে সংঘ পরিবার খুব চিন্তাভাবনা করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কট্টর সমর্থক দীননাথ বাটরা তো গুজরাটে শিক্ষাক্রমের গৈরিকীকরণের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বাটরা তো তাঁর একটি বইয়ে ফ্যাসিস্ত নেতা হিটলারের স্তুতিও করেছেন। বাটরার লেখা ইতিহাস রোমিলা থাপার ইতিহাসের

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘শয়তানের উকিলে’র শয়তানি

একটি ‘সর্বাধিক প্রচারিত’ বাংলা দৈনিকে নভেম্বর ৪ তারিখে প্রকাশিত নিবন্ধের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে, দেশব্রতীর ১৩ নভেম্বর, ২০১৪ সংখ্যায় একটি লেখা লিখেছিলাম। প্রথমোক্ত লেখাটির শীর্ষনাম ছিল ‘‘ছাত্র আন্দোলন বিষয়ে কিছু অপ্রিয় সত্য’’। যদিও লেখাটি তেমন কোন সত্য ভাষণ করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়নি। তবে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্য কোন প্রাকৃতিক অভ্রান্ত নয়, তা দেখার মানুষটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। তাই সেই লেখাতে প্রাক্তন শিক্ষা প্রশাসক লেখকের বাজার সর্বস্ব চিন্তার প্রতিফলনের কথাই উল্লেখ করেছিলাম। আবারও সেই একই দৈনিকে সেই ‘বিদগ্ধ’ অর্থনীতিবিদ লেখকের ‘শয়তানের উকিল’ হিসেবে সদম্ভ ঘোষণার নিবন্ধ মনে করিয়ে দিল বাজারের ওকালতনামা নেওয়া পণ্ডিতরা কিছুতেই আন্দোলনকে বরদাস্ত করতে পারেন না। যাদবপুরের সমাবর্তন সেখানকার অনেক ছাত্রছাত্রী বর্জন করেছেন, তাদের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কেউ কেউ সেই সিদ্ধান্তের অংশীদার হয়েও, বয়কটের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে, অন্য কোন ভাবনার অংশ হয়ে সমাবর্তনে হাজির থেকে শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করেছেন; আবার অনেকে শংসাপত্র নিয়েছেন। এর মধ্যে একজন ছাত্রী সবার থেকে আলাদা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন, প্রচারের আলো তাঁর উপরে বিকীর্ণ হয়েছে কেননা, তিনিই সর্বপ্রথম শংসাপত্র নেওয়ার ডাক পান ও মঞ্চে উঠে উপাচার্যের উপস্থিতিতে তা নিতে অস্বীকার করায় আচার্য রাজ্যপাল কর্তৃক বিতাড়িত হন। সেই ছাত্রীর আচরণ, আমার মনে হয়, বয়কটের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও যথেষ্ট সাহসী ও শ্রদ্ধাযোগ্য। উল্লিখিত নিবন্ধটির লেখক যদিও বলেছেন, ‘‘তাঁর গণতান্ত্রিক এবং অহিংস প্রতিবাদের রূপটিকে অশ্রদ্ধা জানানোর কোনও কারণ নেই’’, তবুও তার পরেই ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে বলেছেন ‘‘মঞ্চে উঠে শংসাপত্র নিতে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি কালকের কাগজে খবর হবেন, এমন মানসিকতা আশা করি তাঁর ছিল না’’। এ ধরণের তির্যক ব্যাজস্তুতি দ্বারা অশ্রদ্ধা প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের মত অকিঞ্চিতজন ওয়াকিবহাল। ছাত্রীটির প্রতিবাদকে অশ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়েই তাঁর দ্বিচারিতাকে প্রকট করলেন অর্থনীতিবিদ লেখক।

ছাত্রী অসম্মাননার পরে পরেই তিনি যথাবিহিত সাম্প্রতিককালীন শিক্ষা সংস্কারের গুণগানে লিপ্ত হলেন। মাননীয় অর্থনীতিবিদ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন। সেই সময়েই তৈরী হয়েছিল বর্তমানে চালু বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়মকানুনের কাঠামোটি। পরে অবশ্য উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত এবং আরও কিছু নিয়মের, যা শাসকের দ্বিতীয় চিন্তায় মনোঃপূত হয়নি, সংশোধন করা হয়েছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগুলোতে ডিনের নিয়োগ নির্বাচনের বদলে নিয়োগ কমিটি দ্বারা সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্য কর্তৃক নিযুক্ত করায় রূপান্তরিত হয়েছে। মাননীয় অর্থনীতিবিদ সেই পুরাতন পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে নতুনটির সপক্ষে যুক্তি আনলেন। যেহেতু নতুন পদ্ধতিতে ডিনেরা কেবল একবার ৪ বছরের জন্য নিযুক্ত হতে পারবেন তাই মৌরসী পাট্টা অন্তর্হিত হল ইত্যাদি। ওনার মতে সম্মানীয় সজ্জন শিক্ষকদের বক্তব্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে গেল এ ধারণা ভ্রান্ত কেন না, এর আগেও বহু মেধাবী এবং সম্মানিত অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল আর তখন কোন প্রতিবাদ হয়নি। ‘শয়তানের উকিলে’র তূণীরে যুক্তিবান যে কম পড়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। ছাত্রীছাত্রদের উপরে পুলিশ পাঠানো, ছাত্রীর যৌন হেনস্থার বিচার না করা, তাঁদের সমাবর্তন বয়কট, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি-ছাত্রীছাত্রদের ও অধ্যাপকদের, এসবের মাঝে ডিন নিয়োগের ‘উন্নত’ পদ্ধতি, আগেকার মৌরসী পাট্টা, এর আগেও বহু মেধাবী এবং সম্মানিত অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া, এসব এসে পড়ল কেন? কারণ ওকালতনামা প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ প্রমাণ করতে চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাজগতে বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনে অপরিসীম দক্ষতা দেখাচ্ছে। তাই সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষায় ঘটে যাওয়া দু-একটি ঘটনাবলীর দিকেই চোখ ফেরানো যাক।

এই মাসেই, জানুয়ারির গোড়ায় পদত্যাগ করেছেন কলেজ সার্ভিস কমিশনের সভাপতি, নতুন এসেও পড়েছেন। কিন্তু কেন আগের জনকে চলে যেতে হল? যতদূর দেখা গিয়েছে, সদ্য প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে তেমন কোন অদক্ষতা বা স্বজন-পোষণ বা নিয়ম বহির্ভূত কাজ করার অভিযোগ ওঠেনি। এই মুহূর্তে কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ নিয়োগের কাজ চলছে। সম্ভবত তা শেষ পর্যায়ে। ঠিক সে সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই তাঁকে চলে যেতে হল কেন? পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে গড়িমসির কারণ কী? তারও আগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল কেন? সিধো-কানহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ শমিত মান্নাকে হঠাৎ অপসারণ করা হয়েছিল কেন? অধ্যাপক চিন্ময় গুহকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটির গঠনে যে সরকারি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা তৎকালীন শিক্ষা প্রশাসক, বর্তমান লেখক অর্থনীতিবিদদের নেতৃত্বে করা হয়েছিল তা আমূল পাল্টানো হল কেন? সর্বোপরি যে শিক্ষামন্ত্রী কলেজে কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও গুণ্ডাবাজী কমাতে কেন্দ্রীয়স্তরে ছাত্র ভর্তির প্রচেষ্টা করেছিলেন তাঁকে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে চলে যেতে হল, আর তার পরেপরেই সেই ব্যবস্থাকে অস্তাচলে পাঠানো হল কেন? এরকম অসংখ্য কেন-র উত্তর দরকার। কিন্ত মাননীয় অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন শিক্ষা প্রশাসকের কাছে সম্ভবত তেমন কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। তিনি মাঝে মাঝেই কলম ধরেন শাসকের কাজের সপক্ষে। মনে পড়ে যাচ্ছে তিনি কেন্দ্রীয় স্তরে ছাত্র ভর্তির বিরুদ্ধে বলেছিলেন তাতে কলেজগুলোর স্বাতন্ত্র নষ্ট হবে। কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, যে সম্পর্কে কোন আইনই বিশ্ববিদ্যালয় বিধিতে নেই, তা নিয়ে আদেশ নির্দেশ দেওয়াতে কলেজের স্বাতন্ত্র যায় না, কিন্তু ছাত্র ভর্তিতে কেন্দ্রীয় পরিচালনায় তা যায়। জানিনা এ ধরণের ওকালতিকে ‘শয়তানের উকিল’ হিসেবে না উকিলের শয়তানি, কোন খাতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে?

- অমিত দাশগুপ্ত

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
“লিবারেশন”
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ২০০ টাকা

‘আচ্ছে দিন’-এর কল্পসৌধ ...

চারের পাতার পর

চাইতে কল্পকথা বলতে পছন্দ করেছেন। আর ইরফান হাবিব এই ইতিহাসকে বলেছেন কলঙ্কোজ্জ্বল কাহিনী। এতদসত্ত্বেও সংঘ পরিবার ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’ সূচীত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে গুজরাটে প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শকে সারা দেশে অভিন্ন পাঠক্রম হিসেবে চালানোর পরিকল্পনা করেছে।

।। ৫ ।।

মুসলিম মতান্ধতা তথা মৌলবাদের বিষয়টিকে কখনও খাটো করে দেখা যায় না একথা যেমন সত্য, তেমনই হিন্দুত্ববাদীদের ক্রমাগত আক্রমণাত্মক ভূমিকা মুসলিম মৌলবাদীদের প্রতি-আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার জায়গাকে অবধারিত করে তুলেছে একতাও সমভাবে সত্য। আর এটাই হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের কূটবুদ্ধির প্রায়েগিক ক্ষেত্র। মধ্যযুগে মুসলিমদের অত্যাচার, হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ, জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধির কারণে এদেশেই হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার চক্রান্ত, অনুপ্রবেশ—ইত্যাকার সহজপাচ্য চাটনির তথ্যাবলী প্রচারে রেখে হিন্দুত্ববাদী প্রকৃত অর্থে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক একটা ধর্মযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে চাইছে। বিজেপি সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লীর ক্ষমতাসীন হওয়ায় হিন্দুত্ববাদীরা আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছে। মসজিদের বিরুদ্ধে মন্দিরের যুদ্ধ ঘোষণা করে হিন্দুত্ববাদীরা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের আঁস্তাকুড় থেকে ফ্যাসিস্ত হিটলারের প্রেতচ্ছায়াকেই জাগিয়ে তুলেছে।

বজরং দলের নেতা এবং বিজেপির একসময়ের সাংসদ বিনায়ক কাটিয়ার বাবরি ধ্বংসের পর বলেছিলেন, রামজাদাদের উচিত হারামজাদাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে সামিল হওয়া। রামজাদা বলতে তিনি অবশ্যই রামচন্দ্রের সন্তান অর্থাৎ হিন্দুদের বুঝিয়েছিলেন, আর হারামজাদা হলো মুসলিম জনসাধারণ! এই বজরং দলের রণনিনাদ হল—যারা ভারতে থাকতে চাইবে, তাদের অবশ্যই রামচন্দ্রের নাম নিয়েই থাকতে হবে! রামজাদাদের এই রণনিনাদ কোন মতাদর্শের প্রতিফলক তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। মনে রাখা দরকার যে রাম ভারতে সমস্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে পূজ্য নন। ১৯৮০-র সময়কালীনও দেখা গিয়েছে যে রামচন্দ্র উড়িষ্যায় আদৌ জনপ্রিয় পূজ্য ব্যক্তিত্ব নন। তামিলনাড়ুতে রামচন্দ্র জনগ্রাহ্য নন। রাম-রাবণের যুদ্ধকে তো দ্রাবিড়ীয় রাবণের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতীয় রামের রামায়নী যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে, দেখা হয়ে থাকে দক্ষিণ ভারতীয় অব্রাহ্মণদের ওপর উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আক্রমণ হিসেবে। স্বভাবতই রামচন্দ্রকে ভারতের সব হিন্দুজনতাই যে মান্যতা দেয়, এমনটি নয়। তবে কি রামজাদাদের এই লড়াই আপাতভাবে হারামজাদাদের বিরুদ্ধে শুরু হলেও তা শুধুমাত্র এখানেই না-থেমে এদেশের রামচন্দ্রকে মান্যতা না দেওয়া হিন্দুদের তথা হারামজাদাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে শেষ অবধি! বিনয় কাটিয়ারের এই উক্তির একুশ বছর পর বর্তমান শাসক বিজেপির এক ‘সাধ্বী’ সাংসদ সেই রামজাদা আর হারামজাদা শব্দদ্বয়ের পুনরুচ্চারণ করে সম্প্রতি আবার অহিন্দুদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন! প্রবল চাপের কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দুত্ববাদী এই ঘৃণাব্যঞ্জক মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি।

সংঘ পারিবারিক নেতৃবর্গের তরফ থেকে এদেশের মুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধে বারবার ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালীন হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার আহমেদাবাদ অধিবেশনে স্পষ্টতই বলেছিলেন যে, ভারতে মূলত দুটি জাতি রয়ে গিয়েছে—হিন্দু এবং মুসলমান। অন্যত্র তিনি আবার বলেছিলেন যে হিন্দুরা হচ্ছে জন্মগতভাবেই উদ্ভুত একটা জাতি (‘নেশন বাই দেমসেলভস’), যার অর্থই হচ্ছে মুসলিমদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস।

সংঘ গুরু গোলওয়ালকর তো আরও একপা এগিয়ে বলেছিলেন—যাঁরা বলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতিরেকে স্বরাজ অর্জন অসম্ভব, তাঁরা আসলে দেশদ্রোহী! অর্থাৎ এভাবেই এঁরা হিন্দু-মুসলিম যুক্ত ঐক্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা ভাই পরমানন্দ (যিনি ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন) তো সরাসরি বলেছিলেন যে ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ হিন্দু-মুসলিম সমস্যার একমাত্র সমাধান সম্ভব। তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল—সিন্ধু প্রদেশের বাইরের বাকি অংশ আফগানিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে একটা বড় মুসলিম রাজ্য গঠন করা উচিত আর সেখানকার হিন্দুদের উচিত সেদেশ ছেড়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে আসা, আর এদেশের মুসলিমদেরও উচিত ঐ নবগঠিত দেশে ফিরে যাওয়া। এভাবেই ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ করে ধর্মের ভিত্তিতেই সম্প্রদায় বিনিময়ের মাধ্যমেই তিনি হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন!

গোলওয়ালকর ঠিক এভাবে দেশভাগের নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে সম্প্রদায় বিনিময়ের কথা না বললেও তিনি হিটলারের ইহুদি নিধন ও ইহুদি খেদানোর ফ্যাসিস্ত কাজকে প্রশংসা করে এ ধরণের কাজকে ‘হিন্দুস্তানের’ ক্ষেত্রেও একটা লাভজনক শিক্ষা বলে মনে করতেন। এই বক্তব্যের নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

গোলওয়ালকর ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইসলাম হচ্ছে ধর্ম হিসেবে প্রথম যা কিনা আমাদের সমাজ সংগঠনের চতুর্বর্ণ প্রথার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে এবং আমাদের সমাজের জাতপাত ও শ্রেণীভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আর একথা বলার মধ্যে দিয়ে তিনি আসলে আমাদের সমাজের জাতপাতভিত্তিক চতুর্বর্ণ প্রথার সপক্ষেই ওকালতি করেছেন। চতুর্বর্ণ প্রথার অনুমোদক হিসেবে ঋকবেদের কথা বলা হয়ে থাকে। ঋকবেদ মানুষের মুখ, হাত, ঊরু এবং পা-এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তার মুখ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু হচ্ছে যোদ্ধা, ঊরু হচ্ছে জনগণ আর তা পা থেকে জাত দাস! —এই সূত্র মাথায় রেখেই সমাজে জাতপাত বজায় রাখার একান্ত পক্ষপাতী সংঘ গুরু গোলওয়ালকর বলেছেন—ব্রাহ্মণ হলো মাথা, রাজা হলে বাহুদ্বয়, বৈশ্য হলো উরু এবং শূদ্র হলো পায়ের পাতা—অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে এই চার রকমের ব্যবস্থা রয়ে গিয়েছে, সেই জাতি অর্থাৎ হিন্দু জাতি আর—এই আমাদের দেবতা!

এইভাবে বর্ণাশ্রম তথা জাতপাতের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এইসব হিন্দুত্ববাদীরা তাদের প্রস্তাবিত হিন্দুরাষ্ট্রে জাতপাতবিরোধী সংগ্রামকে দমন করে প্রাক আধুনিক সামন্তব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান, ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘোরাতে চান! বলরাজ মাধোক যখন বলেন যে, মুসলিমদের মধ্যে যে জিনিসটার একান্তই অভাব তা হল ‘জাতীয় চেতনা’—তখন স্পষ্টতই এই ‘জাতীয় চেতনা’ বলতে বোঝানো হয় হিন্দুত্ববাদী জাতীয় চেতনাকে যা মুসলিমদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভবই নয়। এদেশের তথা ভারতের সবচেয়ে জরুরী সমস্যা বলতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমস্যাকে চিহ্নিত করে যখন দেশের সমস্ত ভিন্ন ধর্মের মানুষের হিন্দুকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তখন তার পরিসরেই পল্লবিত হয় এদেশের মুসলিমদের ‘হিন্দুকরণ’ করার পরিকল্পনা, যে হিন্দুত্ব, যে হিন্দুরাষ্ট্র চতুর্বর্ণ প্রথার ভিত্তিকে বজায় রেখে প্রাক-আধুনিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সপক্ষে জাতপাত বিরোধী আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চায়। (ক্রমশ)

- অশোক চট্টোপাধ্যায়

‘জনরোষের’ তত্ত্ব ঃ ‘চক্রান্তের’ গন্ধ

বলা নেই কওয়া নেই, সভামঞ্চে এক যুবকের চপেটাঘাত খেতে হল টি এম সি’র যুবরাজ নেতাকে। যুবকটিরও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জুটেছে তৃণমূলী গণমার। প্রায় আধমরা অবস্থায় অতঃপর হাসপাতালে। জীবন-মরণের টানাপোড়েন কাটিয়ে এখন নাকি সুস্থ হচ্ছেন। পুলিশ কেস দিয়েছে খুনের চেষ্টার। জামিন অযোগ্য ধারায়। অতএব প্রয়োজনীয় সুস্থ হলে অপেক্ষা করছে পুলিশের হেফাজত।

ঘটনাবলী জেনে যুবকটির পরিবার দাবি করেছে ছেলের কিছুটা মানসিক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সে কথা শাসকপক্ষ সহজে কানে তোলার নাম করছে না। একদিকে তর্কাতর্কির গোলাগুলি চলছে। যুবকটি অপ্রকৃতিস্থ, নাকি সেটা ছল! যা ঘটিয়েছে সেটা ক্ষণিকের উন্মাদনাবশত, নাকি সুপরিকল্পিত! নিছক নির্বুদ্ধিতার, নাকি চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রমূলক! এইসব দ্বন্দ্ব-ধন্দ-কাজিয়া থামাথামি নেই। যুবনেতার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার আকস্মিকতায় শাসক তৃণমূল অবাক। তিনি কোনও তুচ্ছ নেতা নন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী ‘দিদি’-পিসীর পছন্দের উত্তরাধিকারী। তাই গণমার দেওয়ার মধ্যে কোনও গুরুতর অপরাধ দেখা হচ্ছে না। শাসক নেতাদের চোখে যুবকটি যা করেছে সেটাই কেবল গুরুদণ্ডের অপরাধ। সেই যুক্তিজালে মুড়ে দিতেই শাসকদল ও পুলিশ-প্রশাসনের যোগসাজশে চলছে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের সূত্র সন্ধান। কোনরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই ‘পলিটিক্যাল কানেকশন’ জুড়ে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তাও বিচিত্র বৈপরীত্যের! হয় এটা, নয়তো ওটা ছিলই, রঙ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের এক ভারপ্রাপ্ত পুলিশের আই জি দাবি করেছেন যুবকটি আর এস এস করে। অভিযোগের তথ্যপ্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন যুবকটির আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে। যা স্বীকার করলেও আর এস এস কর্মী অভিযোগ যুবকটির পরিবার স্বীকার করেনি। তাদের দাবি এটা মিথ্যা অভিযোগ। আই জি-র আরও দাবি, যুবকটির দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। তৃণমূল রাজত্বের পুলিশ পলিসি কবে থেকে দক্ষিণপন্থী বিরোধী হল! যুবকটির পরিবারের দাবি, কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে যতটুকু যা সম্পর্ক আছে সেটা তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের সাথেই। আই জি যেখানে আর এস এস তকমা দিচ্ছেন, সেখানে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের টি এম সি সাংসদ দাবি করেছেন, যুবকটি উত্তর ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপা কলেজের মারকুটে প্রাক্তন এস এফ আই কর্মী, স্থানীয় থানায় নাকি অনেক পুলিশ কেস আছে টি এম সি পি ছেলেদের পেটানোর! তৃণমূল নেত্রীর কোর নেতা-মন্ত্রীরাও অনেক চক্রান্তের গন্ধ পেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। খাদ্যমন্ত্রীর দাবি, ওটা সব বিরোধী দলের মিলিত চক্রান্ত। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী আবার খুঁজে পেয়েছেন মিডিয়ারও চক্রান্ত। এটা ঘটনা যে, গণমারের দৃশ্য আলোকচিত্রের যন্ত্রে বন্দী করতে গিয়ে মিডিয়ার লোকেরাও আক্রান্ত হয়েছেন, ক্যামেরাও ভাঙ্গচুর হয়েছে। তথ্যপ্রমাণ না রাখতে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এসব ‘কীর্তি’কে ‘যুক্তিযুক্ত’ প্রমাণ করার দায় তো রয়েছেই। তাই মিডিয়াকেও চক্রান্তকারীদের বর্গে ফেলে দেওয়ার অপচেষ্টা। পুলিশ যুবকটির বিরুদ্ধে ভারী কেস দিয়েছে, কিন্তু তৃণমূলীদের বিরুদ্ধে হালকা হালকা, আজও তারা অধরা।

শাসকপক্ষের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন দুঁদে নেতা, সত্তর দশকের সিদ্ধার্থ জমানার পুরানো ঘাঘু এবং আজকের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল—গণমারের ঘটনাটা না ঘটালেও চলত। নিপাট ভণ্ডামীর। প্রশ্নবাণে বিদ্ধ পরক্ষণের প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিল আসল অবস্থানটা কি। দাবি করলেন, যা হয়েছে সেটা ‘জনরোষ’। আর ‘জনরোষের’ মাত্রা বোঝাতে বললেন, ইন্দিরা হত্যার প্রতিক্রিয়ার তুলনায় তমলুকে তেমন কিছুই করা হয়নি। তার মানে প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন হলে কল্পনাতীত বিভৎস হতেই পারে। আরও শুনিয়ে রাখলেন, তৃণমূল ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ বা ‘ভারত সেবাশ্রম’ থেকে লোক নিয়ে রাজনীতি করে না। এই কুটিল নেতাই দুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈকা ছাত্রীর ‘অহিংস প্রতিবাদে মুগ্ধ’ হয়েছিলেন। সে যে কত ভণ্ডামীর সেটাই প্রমাণ হল তমলুকের প্রতিক্রিয়ায়। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। আর তা কেবল ঐ ব্যক্তি নেতার নয়; তাঁর মুখ দিয়ে গোটা তৃণমূলের প্রবণতারই। আক্রান্ত যুবনেতা যে যুবকটিকে ‘ক্ষমা’ করে দেওয়ার আর দলকে ‘শান্তি ও সংযম’ বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন সেটা দল-নেতৃত্বের নির্দেশ বহুল ব্যবহৃত তোতা কৌশল। কদিন বাদেই ‘বিশ্ব বঙ্গ বিনিয়োগ সম্মেলন’। সেটা মাথায় রেখেই তমলুকের প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন নীরবতার কৌশল।

ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে সিনেমা

যাদবপুরে দ্বিতীয় কলকাতা পিপলস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

প্রতিরোধের সিনেমার কারাভান শুরু হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে সংঘ পরিবারের হিন্দুত্বের অন্যতম ল্যাবরেটরি গোরখপুরে ২০০৬ সালে। গেরুয়া সন্ত্রাসের কেন্দ্রে প্রগতিশীল সংস্কৃতির প্রতিরোধ খাড়া করার পরবর্তী বছরগুলোতে প্রতিরোধের সিনেমার যাত্রাপথ ছুঁয়ে গিয়েছে দেশের নানা প্রান্তের শহর, মফস্বল, ছোট শহর, গ্রাম। আজ যখন দেশের মসনদে গেরুয়া ফ্যাসিবাদীরা তখন কলকাতায় পরবর্তী চলচ্চিত্র উৎসব হতে চলেছে। যা প্রতিরোধের সিনেমার ৪৩তম চলচ্চিত্র উৎসব। ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারী, চার দিন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নং গেট দিয়ে ঢুকে ত্রিগুণা সেন হল। সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা।

ফেলে আসা বছরে প্রতিরোধের সিনেমা এই রাজ্যে অনেকগুলো অনুষ্ঠান করে। কখনও ছাত্রদের সাথে মিলে যাদবপুরের আন্দোলনের সংহতিতে অশোকনগরে, কখনও শ্রীলঙ্কার গণহত্যার বিরুদ্ধে, কখনও ইমারজেন্সির দিনে প্রতিবাদী চিত্র-প্রদর্শনী ও প্রখ্যাত চিত্রকার অশোক ভৌমিকের আধুনিক চিত্র-কলায় প্রগতিশীল ধারা নিয়ে অডিও-ভিসুয়াল কথন, আবার কখনও শ্রমিকদের ওপর তোলা তথ্যচিত্রের প্রদর্শন ও তাকে ঘিরে আলোচনা।

জানুয়ারী মাসে আমাদের পথ চলার ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দ্বিতীয় কলকাতা পিপলস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। তারকা খচিত, জাঁকজমকের ফেস্টিভ্যালের বিপরীতে জনতার টাকায় জনতার সমস্যা, আন্দোলন, হাসি-কান্নার চলচ্চিত্র উৎসব। সারা দেশ জুড়ে যখন জনতার সামনে সব থেকে বড় বিপদ কর্পোরেট ফ্যাসিবাদ তখন আমাদের সিনেমার উৎসবকেও আমরা ভেবেছি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের ক্ষেত্র হিসেবে। তাই বেশ অনেকগুলো ছবি মানুষের কাছে তুলে ধরবে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ। তার মুখ ও মুখোশ। উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছে জনগণের সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

উৎসবের উদ্বোধন করবেন ডাঃ বিনায়ক সেন। ছত্তিশগড়ের শঙ্কর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে তৈরি শহীদ হাসপাতালের ওপর নির্মিত ছবি ‘পহলি আওয়াজ’-এর স্ক্রিনিং-এর পর আলোচক হিসেবেও উনি উপস্থিত থাকবেন, পরিচালক ও মানবাধিকার কর্মী অজয় টি জি এবং বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্যকর্মী পুণ্যব্রত গুণের সঙ্গে। উৎসবের মূল ভাষণ রাখবেন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র পরিচালক আনন্দ পটবর্ধন। আর এস এস-এর ক্রমাগত আগ্রাসনের পটভূমিতে যার বিষয়—‘আওয়ার নেশনহুড রি-ডিফাইনড’ (আমাদের পুনর্সংজ্ঞায়িত জাতিত্ববাদ)। উৎসবে ওঁর দুটি ছবিও প্রদর্শিত হবে। মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলনের নানা ধারা ও আন্দোলন থেকে উঠে আসা গানের আজ-কাল-পরশু নিয়ে তৈরি ওঁর সাম্প্রতিকতম ছবি ‘‘জয় ভীম কমরেড’’। এবং বাবরি মসজিদ ভাঙার পটভূমিতে পুরুষতন্ত্র ও ধর্মীয় মৌলবাদের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে তৈরি ওনার ছবি ‘‘পিতা-পুত্র ও ধর্মযুদ্ধ’’।

গুজরাতে মোদীর ফ্যাসিবাদী রাজনীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ছবি করে এসেছেন সদ্যপ্রয়াত তরুণ পরিচালক শুভ্রদীপ চক্রবর্তী। আমরা ওঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গুজরাতে সমীর খান পাঠান, সাদিক জামাল, ঈশরাত জাহাঁ, সোহরাবুদ্দিন শেখ-কৌসর বি-দের ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা নিয়ে তৈরি ওঁর ছবি ‘‘এনকাউন্টারড অন স্যাফ্রান আজেণ্ডা’’ দেখাবো। গুজরাতের উন্নয়ন মডেলের ফানুস নিয়ে লোকসভা ভোটের আগে তৈরি গোপাল মেননের ছবিও উৎসবে দেখানো হবে। নকুল সিংহ সাহনির তৈরি মুজফ্ফরনগর দাঙ্গা নিয়ে তৈরি ছবি ‘‘মুজফ্ফরনগর বাকি হ্যায়’’ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের নারী নির্যাতন ও ‘লাভ জেহাদ’ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে আসা সাংবাদিক নেহা দীক্ষিত উপস্থিত থাকবেন বিজেপির ‘লাভ জেহাদ’ নিয়ে ভুয়ো প্রচারের ওপর অডিও-ভিজুয়াল উপস্থাপনা দিতে।

সংঘ-পরিবার নিয়ে একাধিক তথ্যচিত্র ছাড়াও নারী আন্দোলন নিয়ে একাধিক ছবি উৎসবে দেখানো হবে। বিগত বছরে তৈরি তথ্যচিত্র ‘গুলাবি গ্যাং’, ‘‘দ্য ওয়ার্ল্ড বিফোর হার’’ (আর এস এস পরিচালিত ‘‘দুর্গা বাহিনী’’ ক্যাম্পের প্রথম ছবি তোলা হয় এই ছবিতে), দীপা ধনরাজের ছবি ‘‘ইনভোকিং জাস্টিস’’ (তামিলনাড়ুর মেহনতি মুসলিম মহিলারা ১২০০০-এর বেশি সদস্যের তাঁদের নিজস্ব জামাত বানিয়ে পুরুষতান্ত্রিক জামাতের বিরুদ্ধে নারী অধিকারের পক্ষে লড়ছেন—সেই নিয়ে তথ্যচিত্র) সহ একাধিক ছবি। উৎসবের প্রথম দিন থাকছে ছোটদের সেশন। বিভিন্ন স্কুলের বাচ্চাদের সামনে ‘সিনেমার গল্প ঃ সিনেমা কীভাবে এল’। দেখানো হবে ইরান, আর্জেন্টিনা ও অন্য জায়গায় তৈরি একাধিক ছোটো ছবি। আর জাতিভেদের প্রেক্ষাপটে কিশোর-কিশোরীর ভালবাসার ওপর নির্মিত কাহিনী চিত্র ‘‘ফান্ড্রি’’। থাকছে আলোচনা সভা। উৎসব ঘিরে বাঁধা হচ্ছে গান। প্রকাশিত হচ্ছে বিশেষ স্মারক সংখ্যা। বিশদ জানতে দেখুন ওয়েবসাইট corkolkata.wordpress.com.

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সম্মেলন

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের জগাছা আঞ্চলিক কমিটির ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কমরেড বিভাস বসু (সাঁতরাগাছিতে) মঞ্চে। প্রয়াত পার্টি সদস্য ও গণআন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। ভোলানাথ চৌধুরী, বাবু মণ্ডল ও সেখ আসগার আলিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। অতিথি প্রণব মণ্ডল সভায় আগত প্রতিনিধিদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতন থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। পর্যবেক্ষক এ আই সি সি টি ইউ-র জেলা সভাপতি দেবব্রত ভক্ত রাজ্য সরকারের নৈরাজ্য ও দুর্নীতির কথা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও জনবিরোধী এবং কর্পোরেটমুখী নীতির বিরোধিতা করে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজকর্মে রাজ্য সরকারের আমলা ও একশ্রেণীর কর্মচারীদের বাধা সৃষ্টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভাজন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে সচেতন করেন। শ্রমিকশ্রেণীকে ঐকবদ্ধ করে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেন।

মোট প্রতিনিধিদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন মহিলা প্রতিনিধি। খসড়া প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নেন এক-দশমাংশ প্রতিনিধি। তাদের বক্তব্যের মূল কথা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নয়, সংগঠনকে শক্তিশালী ও প্রসার ঘটানোর জন্য নিয়মিত বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং পাশাপাশি নিজের পরিচিত শ্রমিকদের সংগঠনে আনতে হবে। শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ওপর জোর দেওয়ার কথা উঠে আসে। সংগঠনের বিস্তার ঘটানোর জন্য ১৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন মনসুর আলি মিদ্দ্যা এবং যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন সুব্রত প্রামাণিক ও আসগার আলি। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলন শেষ হয়।

জমি অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে কৃষক বিক্ষোভ

গত ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে কৃষক বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয় বিষ্ণুপুর ২ নং ব্লকের বাজার সংলগ্ন বাখরাহাট হাই স্কুল মোড়ে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা সভাপতি জগদীশ মণ্ডল ও বিষ্ণুপুর ২ নং ব্লক সম্পাদক শৈলেন চ্যাটার্জী। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক দিলীপ পাল। দীর্ঘক্ষণ চলা সভা ঘিরে স্থানীয় কৃষক ও কৃষিমজুরদের মধ্যে উৎসাহ ধরা পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে। সি পি আই (এম এল) জেলা সম্পাদক কিশোর সরকার মোদী সরকারের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিকদের জল, জমি, জঙ্গল বিক্রি করে দেওয়ার ন্যক্কারজনক পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে দৃপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। বিপন্ন গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, শ্রম সংস্কারের বিষয়গুলোও তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেন। সভা সফল করতে স্থানীয় পার্টি কমিটি ও দরদীরা উদ্দীপক সহযোগিতা প্রদর্শন করেন।

আগামীদিনে বামপন্থীদের নেতৃত্বে বৃহত্তর কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে অর্ডিন্যান্সটিকে ছেঁড়া কাগজে পরিণত করার বার্তা দিয়ে সভা শেষ হয়। সভার সঞ্চালক ছিলেন নিখিলেশ।

‘‘আজকের দেশব্রতী’’ জানুয়ারি মাসের মধ্যে গ্রাহক অভিযান সম্পন্ন করুন

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com